গোয়েন্দা গল্প

আয়ন

আনন্দ বাগচী

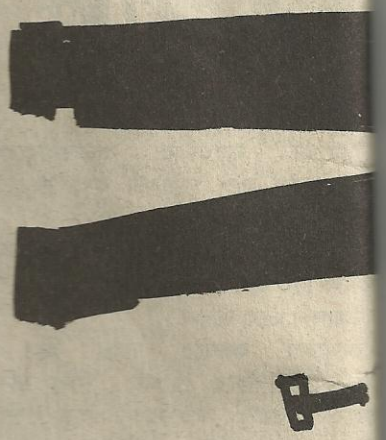

কিন্নরদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছনোর আগেই সুনন্দর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। খুনটুন নয় তো? ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা পুলিশের জিপ, ভ্যানগাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। সেই খালি গাড়িগুলোর পাশে খাকি পোশাকে কয়েকজন লোক খৈনি ডলতে-ডলতে নিচু গলায় কী যেন আলোচনা করছিল। তবে কি কিন্নরদের বাড়িতেই কিছু হয়েছে? আজকাল ফ্ল্যাটে ঢুকে ডাকাতি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা তো আকছার ঘটছে। বন্ধুর বিপদের আশঙ্কায় কেমন দিশেহারা হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

একতলার অ্যাপার্টমেন্টের জানলা দিয়ে কিন্নর ওকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "এই সুনন্দ, শুনেছিস, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে দোতলায়। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না, কিরণকাকু নেই!"

"নেই! নেই মানে?" সুনন্দ হাঁ হয়ে যায়।

"নেই মানে ইয়ে, মারা গেছেন! হার্ট ফেলিওর।"

"সে কী! আমি যে ওঁর জন্যেই," পেছনে বিচিত্র রবের হর্ন শুনে রাস্তা ছেড়ে সরে গিয়েই সুনন্দ চমকাল। দেখল কমলেশকাকা তাঁর মিউজিয়াম মাস্টারপিস থেকে নামছেন। এ যুগে এই কিম্ভূত মডেলের গাড়ি ভাবাই যায় না।

"কী রে! তুই এখানে?"

অতশত জবাব দেওয়ার সময় ছিল না। শুধু বলল, "এ আমার বন্ধু কিন্নর সেন। একতলায় থাকে।"

"কিন্নর? বাঃ চমৎকার নাম! তোমার সঙ্গে একটু পরে এসে আলাপ করব, কেমন? এই, তুই আয় তো আমার সঙ্গে। কুইক!" হাত ধরে ছোট্ট করে একটা টান দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কমলেশকাকা বললেন, "অন ডিউটি না, বুঝতেই পারছিস। আমার বুজুম ফ্রেন্ড কুশলকিরণ ঘোষ চলে গেল রে! খুবই রহস্যময়ভাবে। ফোন পেয়েই যেমন ছিলাম ছুটে আসছি।"

সুনন্দ দেখল ওঁর পরনে ঘরে পরার ধ্যাস্তানো পাজামা আর হাফ পাঞ্জাবি। অবাক হয়ে বলল, "ওঁকে তুমিও চিনতে?"

"চিনতাম মানে?" ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, "বললাম না, ছেলেবেলার বন্ধু? কত বড় লেখক!" বলেই হঠাৎ কিছু একটা খটকা লেগেছিল বোধহয়, তাই 'হুঁ' বলে ওর মুখের দিকে আর-এক ঝলক তাকালেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ফ্ল্যাটের দরজায় মোতায়েন কনস্টেবল হাঁ-হাঁ করে পথ আগলে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে এক দাবড়ানি। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা যেন চাবুক খেয়ে সিধে হয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে প্যাসেজে দু'জন পুলিশ অফিসারকে দেখা যাচ্ছিল। একজন থানার ও.সি.। অন্যজন লালবাজারের ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর। দু'জনেই ছুটে এসে স্যালুট করলেন, "আসুন সার! কাজ প্রায় শেষ, শুধু আপনার জন্যেই..."

ভেতরের ঘরে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। একগাদা লোক সেখানে সন্তর্পণে চলাফেরা করছিল। কেউ দেওয়ালের গায়ে মাছির মতো সেঁটে রয়েছে, কেউ টেবিলে হুমড়ি খেয়ে যেন গন্ধ শুঁকছে।

এটাই ছিল ওঁর লেখার ঘর। দিনসাতেক আগে কিন্নর ওকে নিয়ে এসেছিল সকালের দিকে। ব্যাপার এই, ছোটদের একটা পত্রিকা বের করবে বলে সুনন্দ খুব তোড়জোড় করে লেগেছে। এত বড় একজন লেখকের যে-কোনও একটা লেখা পেলেই ওরা বর্তে যাবে, তাই কিন্নরকে ধরেছিল। কিন্নর ওঁর নাড়িনক্ষত্র জানে, তাই বলে দিয়েছিল একবার লেখায় বসে গেলে কেউ মাথা খুঁড়লেও উনি দেখা করেন না। ঠিক সকাল সাতটায় উনি দাড়ি কামাতে বসেন। সব কিছুই ওঁর ঘড়ি ধরে, একচুল নড়চড় হওয়ার জো নেই। আসলে স্বাধীন মানুষ, লেখাই ওঁর জীবিকা, লেখাই ওঁর চাকরি। দিনে দশ ঘণ্টা করে লেখেন। প্রথম খেপ ভোর সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা। তারপর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার পর চা দিয়ে গেলে চা খান। দাড়ি কামিয়ে স্নানটান সেরে আটটায় ব্রেকফাস্ট। খবরের কাগজে চোখ বুলনো। সাড়ে আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘণ্টা লিখে উঠে পড়েন। আহারান্তে একটু গড়িয়ে নিয়ে ফের তিনটে থেকে ছ'টা। চা খেয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসেন। সন্ধেয় বন্ধু-বান্ধব, সম্পাদক প্রকাশক কি প্রতিবেশীরা কেউ এলে দেখা করেন। গল্পগুজবও হয়। রাতে আর কলম ধরেন না, পড়াশোনা করেন। এই রুটি অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেন সপ্তা সাতদিনই। এত পুরস্কার, এত সংবর্ধনা অ প্রশস্তি তো আর অকারণে পাননি। এ বাংলায় জীবিতদের মধ্যে, তিনিই বল গেলে এক নম্বর লেখক। ফ্ল্যাটের দরজ খোলা ছিল। কিন্তু ঘরের দরজা উনি স্কা থেকে বন্ধ করেই রাখেন। এটাই নিয়ম বাড়ির লোকজন সবাই জানে। দা কামাতে বসেছিলেন। ঠিক সাতটায় ও নক করতে দরজা খুলে দিলেন। সব শু বললেন কথা দিতে পারছেন না। সাতদি পরে ঠিক এই সময়ে সুনন্দ যেন তাঁকে এক ফোন করে। তখন তিনি বলবেন আদৌ লিখতে পারবেন কি না।

আজ ঠিক সাতটাতেই সুনন্দ ফো করেছিল কিন্তু পর-পর দু'বার রং নাম্বার হ যাওয়ায় মিনিট সাতেক দেরি হ গিয়েছিল। তারপর ফোন বেজেই গেল উ

ধরলেন না। একটু সময় দিয়ে-দিয়ে বারতিনেক চেষ্টা করল কিন্তু একই ফল হল। ফোন উনি তুললেনই না। বোঝাই গেল উনি রেগে গিয়েছেন। তাই খুব মনমরা হয়েই কিন্নরের কাছে ছুটে এসেছিল সুনন্দ। এসে শুনল এই কাণ্ড !

লেখার ঘরখানা বেশ প্রশস্ত। পুব দিকে বিশাল জানলার একপাশে ছোট্ট একটা টেবিলে চা-ব্রেকফাস্ট হয়। তলায় দু'থাক দেরাজে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, মশলা-মুখশুদ্ধি আর হঠাৎ দরকারের ওষুধপত্র থাকে। প্রায় তার গায়ে-গায়েই বেশ বড়সড় লেখার টেবিলে টেলিফোন, কারুকাজ করা কলমদানি, স্বামী বিবেকানন্দের ফ্রেমে দাঁড় করানো রঙিন ছবি, ধূপদান আর সুদৃশ্য শেড দেওয়া, যে-কোনও দিকে ঘোরানো-ফেরানো যায় এরকম টেবিল ল্যাম্প। পাশেই ঘূর্ণি বুকশেল্‌ফে ঠাসা রেফারেন্স বই। র‍্যাক পেরোলে ব্যালকনির দরজা আর অ্যাটাচ্‌ড বাথ।

চায়ের টেবিলের ঠিক উলটো দিকে পশ্চিমের জানলার তলায় মেঝের ওপরে প্রায় চিত হয়ে পড়ে ছিলেন কুশলকিরণ। কীরকম বেকায়দা ভঙ্গিতে। একটু তফাতে রেজারটা ছিটকে পড়ে আছে। এক গাল কামানো। অন্য গালে সাবানের ফেনা পুরু হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। চোখ আধখোলা, মৃত্যুযন্ত্রণায় কোঁচকানো। ওদিকে টেবিলের দিকে চোখ ফিরিয়ে সাবান মাখানো ব্রাশ, জলের বাটি আর শেভিং ক্রিমের টিউব, আফটার শেভ লোশনের শিশি রয়েছে দেখতে পেল। গালে রেজারের মাত্রই একটা কি দুটো টান দিয়ে হঠাৎ পশ্চিমের জানলার কাছে কেন যে তিনি উঠে এসেছিলেন, বোঝা গেল না। তাঁকে কি কেউ ডেকেছিল ? তাঁকে এভাবে এখানে কি কেউ ডাকতে পারে ?

সুনন্দ পায়ে-পায়ে পশ্চিমের জানলায় গিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বডি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বছর পঞ্চাশ বয়সের কিরণবাবুকে দেখতেই শক্তপোক্ত ছিল। কিন্তু মানুষটার নাকি হার্টের ব্যামো ছিল। নীচে এই হাউসের পেছন দিকের ফালি জমিতে কিচেন গার্ডেন টানা চলে গেছে। লতানে শশা, ভুঁইকুমড়ো, টম্যাটো আর লালশাক, ফুলকপির চাষ। চলাফেরা করার পথ নেই। তারপর মাথার কাঁটাতার জড়ানো এক মানুষ সমান পাঁচিল। পাঁচিলের ও-পিঠেই বোধ হয় লম্বা ডোবার সাইজের পুকুর ছিল একটা। ঘেঁষ ফেলে বোজানো হয়েছে। তার ওপাশে চোরকাঁটায় ছাওয়া ঘেসো জমি সাফ করে হাউসিং-এর গোটাতিনেক বাড়ি উঠছে। শুধু পিলার, মেঝে আর সিঁড়ি হওয়ার পর কোনও কারণে কাজ বন্ধ আছে। কমলেশকাকা পাশে এসে বললেন, "যা ভাবছিস, অসম্ভব।" সুনন্দ সত্যিই চমকাল। সে সত্যিই ভাবছিল। অসম্ভব। শুধু অসম্ভবই নয়, অর্থহীন, হাস্যকর। এদিক থেকে ভদ্রলোককে ডাকা দূরে থাক, এমন কোনও শব্দ-টব্দ করার লোকও নেই যা শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবেন।

সুনন্দর কথা সব শুনে কমলেশকাকা বললেন, "তার মানে তুই যখন প্রথম রিং হতে শুনেছিলি তখন কুশল ওয়াজ অলরেডি ডেড। সদর বন্ধ ছিল। ওঁর স্ত্রী নবনীতা কিচেনে, গ্যাসে চাপানো প্রেশার কুকার সিটি দিচ্ছিল। অন্যদিকের একটা বেডরুমে বাইশ-তেইশ বছরের ভাগ্‌নে রূপেন দরজা বন্ধ করে শীর্ষাসন করছে। ফোন বেজে যাচ্ছে, অনেকক্ষণই কারও কানেই যায়নি। পরে শুনতে পেয়ে ওঁর স্ত্রী গিয়ে দেখেন ভেতর থেকে লেখার ঘরের দরজা বন্ধ। ফোন শেষবার বাজতে-বাজতে থেমে গেল। মেঝের ওপর কুশল পড়ে আছে। রূপেন ব্যায়ামের পোশাকেই ছুটে গিয়ে তেতলা থেকে ওঁর বন্ধু ভবনাথবাবুকে ডেকে আনে। তিনি তখন মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে সবে লুঙ্গি আর ফতুয়া চাপিয়েছেন, সেইসঙ্গে চায়ের জল। কারণ স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা এখানে নেই, বাইরে কোথায় বিয়েবাড়িতে গেছে। লোক জড়ো করে দরোয়ানকে ডেকে ঘরের কপাট ভেঙে ভেতরে ঢোকা হয়। ভবনাথই থানায়, লালবাজারে ফোন করেন। লালবাজার আমাকে।"

"কাকু, ডাক্তার কী বললেন ?" সুনন্দ জানতে চায়।

কমলেশ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, "হার্ট ফেল। কিন্তু বাঁ হাতের তালুতে একটা পোড়া সাদা দাগ দেখতে পেয়েছেন। টাটকা। সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ কর, তোকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এ-ঘরের যা কিছু দেখার ইচ্ছে খুঁটিয়ে দেখে নে। আমরা তারপর ওপাশের ঘর থেকে ভবনাথবাবুকে ডেকে নিয়ে ওপরে ওঁর ঘরে যাব। ওঁর মুখ থেকে আলাদা করে কিছু শুনব।"

গ্রিলে পিঠ ঠেকিয়ে পেছনে হাত রেখে সুনন্দ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ হুল ফোটার মতো খচ্ করে আঙুলে কিছু বিঁধতেই সুনন্দ ভয়ে চমকে উঠেছিল। রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘরে স্নায়ু এমনিতেই এমন টানটান হয়ে থাকে, ভিতু-সাহসীর কোনও ব্যাপার নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, কিছুই না, একগুছি তামার তার গ্রিলের নীচের দিকের একটা পাতে কেউ বেঁধে যেন আংটি বানিয়েছে। ছেলেবেলায় সুনন্দও করেছে, তবে আঙুলে। হাইট দেখেই বোঝা যায় কোনও বাচ্চা ছেলে কিংবা মেয়ের কাজ। ভাগ্যিস, কমলেশকাকা তার চমকে ওঠা দেখতে পাননি, সেই সময় সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, নইলে ভিতু বলে ঠাট্টা করতেন। তারের গুছিটার প্যাঁচ খুলে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কমলেশ বললেন, "কী করিস!"

"ও কিছু না।" সুনন্দ মুচকি হেসে বলল, "চলো, যাবে না?"

ভবনাথ সদর বন্ধ করে যেতেও ভুলে গিয়েছিলেন, সময় পাননি। ওদের নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "আসুন, আসুন।"

সোফার ওপরে দলা পাকিয়ে ফেলে রাখা পাজামা-পাঞ্জাবি আর টুকিটাকি তুলে নিয়ে বললেন, "আপনারা বসুন, আমি আসছি। চা খাবেন? ইস, আমার চায়ের জল বোধহয় ফুটে শুকিয়ে গেল।"

কমলেশ মাথা নেড়ে জানালেন, না। ফিরে আসতেই কমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বোধহয় কোনও শব্দটব্দ শোনেননি?"

"কিসের শব্দ? না। তবে নীচের তলার ভদ্রলোক নাকি ধুপ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিলেন। কুশলের লেখার ঘরের ঠিক নীচেই ওঁর ঘর কিনা। তবে গুরুত্ব দেননি।"

"আচ্ছা রূপেন সম্পর্কে আপনার..."

"না, না, ও খুব ভাল ছেলে। একটু ডাল হেড, শরীরচর্চা নিয়েই মেতে থাকে। মামা-মামির অবর্তমানে ওই অবশ্য সব কিছু

পাবে। তবে ছেলেটার টাকা-পয়সার লোভ নেই। কুশলরা নিঃসন্তান, রূপেনকেই ওরা ছেলের মতো দেখত। আচ্ছা, জানেন, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, কুশলের নাম এবার নোবেল পুরস্কারের জন্যে উঠেছে। এবার যদি নাও হয়, সামনের বছরে পেয়ে যেতেও পারত!"

কমলেশ ঠাট্টা করে বললেন, "আপনার হিংসে হয়নি? আপনিও তো লেখক মশাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভবনাথ বললেন, "কী যে বলেন ভাই! কিসে আর কিসে। আমি ওর পায়ের নখের যুগ্যিও না।"

আরও দু-একটা কথার পর সুনন্দ মাঝে পড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভবকাকা, ওঁর ঘরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে কখনও ঢুকত?"

"না, কেন ঢুকবে না!" ভবনাথ হাত নেড়ে বললেন, "কুশল বাচ্চাদের ভীষণ ভীষণ ভালবাসত! ওই তো একতলার ভদ্রলোকের ভাইয়ের দুটি যমজ মেয়ে প্রায় ওর ঘরে ঘুরঘুর করত। কেন বল তো?"

সুনন্দ হেসে বলল, "এমনিই।"

ক'দিন পরে কমলেশকাকা সুনন্দদের বাড়িতে এসে হাজির। বললেন, "জানিস, বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে ইলেকট্রিক শক দিয়ে কুশলের হার্টফেল করানো হয়েছে। কিন্তু কী করে, সেটাই ধরতে পারা যাচ্ছে না।"

সুনন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "তাই বলো! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ইস কাকু, এই সোজা ব্যাপারটা আমি ধরতেই পারিনি। আমি কী মুখ্যু!"

কমলেশ সোজা হয়ে তাকালেন, "কী বকছিস পাগলের মতো?"

"হয়তো পাগলামিই করছি। আমার মনে হয় পশ্চিমের জানলার গ্রিলটা ইলেকট্রিফায়েড করে রাখা হয়েছিল। এই দ্যাখো,"— বলেই সুনন্দ ছুটে গিয়ে ওর টেবিল থেকে ইঞ্চি দুই-আড়াই লম্বা একগুছি তামার তার এনে দেখাল, "এ কোনও বাচ্চা মেয়ের কম্মো না।"

"এইটুকু তার দিয়ে? কোথায় পেলি?"

"গ্রিলে জড়ানো ছিল। পরে টেনে ছিঁড়ে নেওয়ার সময় এটুকু থেকে গিয়েছিল।"

"অ্যাঁ! তোর কথা ঠিক হলে বলতে হয় বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরার ফলেই কুশল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়? কিন্তু যে করেছে তার মোটিভ কী? আর কী করেই বা সে কুশলকে ওখানে টেনে নিয়ে গেল, গ্রিল ধরতে বাধ্য করল? ঘর তো ভেতর থেকে বন্ধই ছিল।"

"মোটিভ-টোটিভ আমি জানি না। তবে কী করে নিয়ে গিয়েছিল অনুমান করা যায়। হত্যাকারী পেছনের দিকের হাউসিংয়ের বাড়িটার তিনতলায় উঠে একটা ছোট হাত আয়না দিয়ে কুশলবাবুর সামনের আয়নায় রোদ্দুরের ঝলক ফেলতে থাকে। অবাক আর বিরক্ত হয়ে তিনি ব্যাপারটা দেখার জন্যে পেছনের জানলার দিকে আসেন। কোত্থেকে আলোটা আসছে বুঝতে পেরে ওপরের দিকে তাকান। কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। মুখের ওপর আলো এসে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ব্যাপারটা সামলাতে বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরেন সঙ্গে-সঙ্গে। লোকটা ছুটতে-ছুটতে নিজের ঘরে ফিরে আসে আর তারটা টেনে ছিঁড়ে নেয়। আংটাটুকু গ্রিলের সঙ্গে লেগে থাকে। আগের রাতেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু কানেকশন দিয়েছিল ভোরবেলা। তারপর ওবাড়িতে উঠে রোদ ওঠার অপেক্ষায় বসেছিল।"

"ওয়ান্ডারফুল গপ্পো!" কমলেশ হাসলেন, "কিন্তু লোকটা কে? রূপেন, না নীচের তলার কেউ?"

"ভবনাথবাবু!" সুনন্দ মাথা চুলকে বলে, "তুমি খেয়াল করোনি, আমি দেখেছি। সোফার ওপর ছাড়া জামা-পাজামার সঙ্গে একটা গোলমতো আয়না আর তারের বান্ডিল (প্লাগ-পিন সুদ্ধু) তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। চায়ের জলের ব্যাপারটা নিশ্চয় বানানো।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী